

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসের ভাবনা:
'দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়বো, তারুণ্যের বাংলাদেশ গড়বো'
মাহবুবুর রহমান তুহিন

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ভরা বাংলাদেশ একই সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল, অসংখ্য নদ-নদী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে বাংলাদেশে প্রায়ই ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন ও অন্যান্য দুর্যোগ আঘাত হানে। এসব দুর্যোগে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হয়। তাই দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতনতা ও প্রস্তুতির গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে প্রতি বছর ১০ মার্চ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালন করা হয়।

প্রতিবারের মতো এবারও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী দিবসটি পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- 'দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়বো, তারুণ্যের বাংলাদেশ গড়বো'। তরুণরাই আমাদের আলোকিত আগামী। তারুণ্যের সম্মিলিত সাহস জাতিকে উদ্দীপ্ত করে, আলোড়িত করে, অনুপ্রাণিত করে। আমাদের সমস্ত অর্জনের অনুঘটক তারুণ্য। ১৯৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে সর্বশেষ ২০২৪'র জুলাই গণ-অভ্যুত্থান এর জীবন্ত ও জ্বলন্ত উদাহরণ। আমরা বিশ্বাস করি দুর্যোগ কালরাত মোকাবিলা করে আমাদের জন্য সোনালি সকাল নিয়ে আসবে। যে সকাল আমাদের সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি আর সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। এ প্রেক্ষিতে এবারের প্রতিপাদ্য বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব বহন করে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ভয়াবহ অনেক দুর্যোগের ঘটনা রয়েছে, যা আমাদের প্রস্তুতির গুরুত্ব বারবার মনে করিয়ে দেয়। ১৯৭০ সালের ভয়াল ঘূর্ণিঝড় ছিল বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সে সময় প্রায় ৩ থেকে ৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে বলে বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসে অসংখ্য গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ আবারও এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের মুখোমুখি হয়। এ দুর্যোগে প্রায় ১ লাখ ৩৮ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় এবং প্রায় এক কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘরবাড়ি, ফসল ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। এই বিপর্যয় বাংলাদেশকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে।

পরবর্তীতে ২০০৭ সালে আঘাত হানে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'সিডোর'। প্রায় ২৪০ কিলোমিটার গতির বাতাস ও জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় অঞ্চল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারি হিসাবে প্রায় ৩ হাজার ৫ শত মানুষের মৃত্যু ঘটে এবং কয়েক মিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে অতীতের তুলনায় ক্ষয়ক্ষতি কম হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল আগাম সতর্কবার্তা, সাইক্লোন শেল্টার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয় ভূমিকা। সাম্প্রতিক সময়েও দুর্যোগের ঝুঁকি কমেনি। ২০২০ সালে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' বাংলাদেশ ও ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে। যদিও আগাম প্রস্তুতি ও ব্যাপক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থার কারণে সম্ভাব্য বড়ো ধরনের প্রাণহানি অনেকটাই এড়ানো সম্ভব হয়।

এই অভিজ্ঞতাগুলো প্রমাণ করে— দুর্যোগ পুরোপুরি ঠেকানো না গেলেও যথাযথ প্রস্তুতি থাকলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উপকূলীয় অঞ্চলে হাজার হাজার সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন এবং জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বের কাছে একটি সফল উদাহরণ হিসেবে পরিচিত।

তবে এ সাফল্যে উদাসীন হয়ে বসে থাকলে চলবে না। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে বাংলাদেশে দুর্যোগের ধরণ ও তীব্রতায় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। অতীতে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস বেশি দেখা গেলেও বর্তমানে বজ্রপাত, তাপপ্রবাহ, ভূমিধস, নগর বন্যা এবং নদীভাঙনে ঝুঁকিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, আকস্মিক বন্যা এবং দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার ঘটনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব নতুন বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি কার্যক্রমকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ভূমিকম্প ও বজ্রপাতের বিষয়ে জনসচেতনতা আগের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এখনও অনেক ক্ষেত্রে সচেতনতা প্রয়োজন রয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকার গণমাধ্যমে প্রচারণা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ বিভিন্ন মহড়া আয়োজন করছে। বজ্রপাতের ঝুঁকি কমাতে দেশব্যাপী তালগাছ লাগানোর উদ্যোগ এবং নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণে সচেতনতা বাড়ানো হচ্ছে। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও দুর্যোগ সচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা দুর্যোগের কারণ, ঝুঁকি এবং নিরাপদ আচরণ সম্পর্কে জানতে পারছে। এছাড়া অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়া এবং অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এসব মহড়া আরও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সাধারণ মানুষ পরিবারভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি নিতে পারে। যেমন- পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জরুরি পরিস্থিতিতে কী করতে হবে তা নিয়ে পরিকল্পনা করা, জরুরি যোগাযোগ নম্বর সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানি ও ওষুধ প্রস্তুত রাখা। ভূমিকম্পের সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া, বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠ বা গাছের নিচে না থাকা এবং ঘূর্ণিঝড়ের সময় দ্রুত আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যাওয়া-এসব বিষয়ে সচেতন থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্যোগের আগাম সতর্কতা প্রদান বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ কাজে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করে থাকে। প্রধানত বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর আবহাওয়ার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ঘূর্ণিঝড়, ঝড়-বৃষ্টি বা অন্যান্য আবহাওয়াজনিত দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রদান করে। একইভাবে বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে আগাম তথ্য দিতে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র নদীর পানির স্তর ও প্রবাহ বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য বন্যার পূর্বাভাস দেয়। এসব তথ্যের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে তা সমন্বয় করে। পরে গণমাধ্যম, মোবাইল বার্তা এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় জনগণের কাছে দ্রুত সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ আগাম প্রস্তুতি নিতে পারে এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর সমন্বয়ের জন্য জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন দূর ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করা হয়। এছাড়া নিয়মিত সভা, প্রশিক্ষণ ও মহড়ার মাধ্যমে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। এসব কমিটি স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। দুর্যোগের আগে সচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগের সময় উদ্ধার কার্যক্রম এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমে এসব কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রথমে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও সহায়তা কার্যক্রম শুরু করেন। সরকার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করেছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম দিয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকার ভূমিকম্পের দুর্যোগ লাঘব ও উদ্ধার অভিযান ত্বরান্বিত করতে ঢাকা মহানগরীতে ১ লাখ স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। চট্টগ্রাম ও সিলেটসহ অন্যান্য মহানগরীতেও এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় স্যাটেলাইট তথ্য, ডিজিটাল আবহাওয়া পূর্বাভাস, মোবাইল এসএমএস সতর্কবার্তা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং সাইরেন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে জনগণের কাছে সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। তাই সম্ভাব্য বড়ো ভূমিকম্প মোকাবিলার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর সমন্বয়ে উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিত মহড়া আয়োজন করছে। একই সাথে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণসহ নানা ধরনের কার্যক্রম চলমান। বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো বড়ো শহরগুলোতে নগর অনুসন্ধান ও উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জরুরি সাড়া প্রদানের ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগের প্রকৃতি ও তীব্রতা পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অভিযোজনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ, জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সরকার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো উন্নয়ন, নদীভাঙন প্রতিরোধ এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। এসব পদক্ষেপের ফলে অতীতের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে দুর্যোগে প্রাণহানি কমানো সম্ভব হয়েছে। দুর্যোগ পুরোপুরি প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও সচেতনতা ও প্রস্তুতির মাধ্যমে এর ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমানো সম্ভব। তাই সবাইকে দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং সরকারি নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। আমরা যদি সবাই মিলে প্রস্তুত থাকি, তাহলে একটি নিরাপদ, সচেতন ও দুর্যোগ-সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

#

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার